জ্বরের উপকারিতা
ও আরও গল্প

পবিত্র সরকার

পুনশ্চ

ভূমিকা

কিছু গল্প নিজের, কিছু গল্প অনুবাদ। অনুবাদ মূলত ইংরেজি থেকে। সেগুলি সাজিয়ে তৈরি হল আমার ছোটোদের গল্পের আর একটি বই। পুনশ্চ-র শ্রীমান সন্দীপ নায়কের সহৃদয়তায়।

যে-পাঠকদের জন্য লেখা আর অনুবাদ, তাদের ভালো লাগলে লেখক সবচেয়ে বেশি খুশি হবে।

১ বৈশাখ, ১৪২৪
'সেঁজুতি'
২১ কেন্দুয়া মেন রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৮৪

পবিত্র সরকার

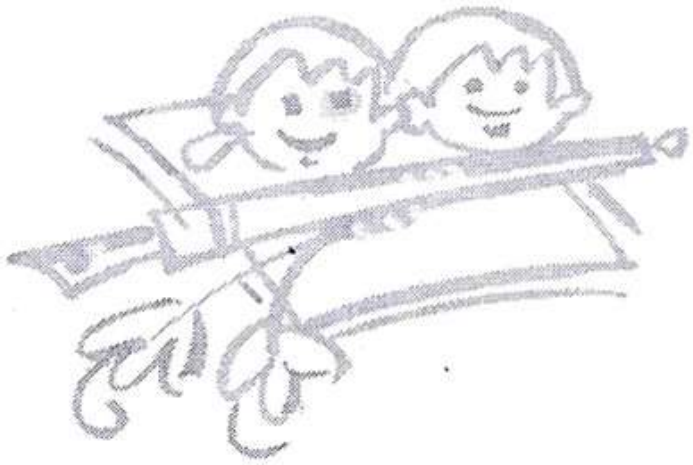

সূচিপত্র

সংকট মোচন	১১
বিজ্ঞান-প্রদর্শনী ও এক জ্ঞানবাবু	১৪
খ্যাপামঞ্জিল	২২
কেন কখনও জ্বর হওয়া দরকার	২৭
একটি বিতর্কিত ব্যাপার	৩২
জগুর দুশ্চিন্তা	৩৮
জাদু-আংটি	৪৪
হারানো উইল	৫০
সারসের মুখ লাল কেন?	৫৮
পিচ-ভোম্বল	৬২
ইয়ানা আর বারো মাসের গল্প	৬৯
বুজাকি জিঙ্গিলাপো	৭৬
জুমরাদ আর কিস্মত	৭৮
খ্যাঁকশেয়াল আর সারস	৮১
মেঘপরিদের দেশে	৮৫

॥ সংকট মোচন ॥

টুকটুকির দাদু অধ্যাপক করঞ্জাক্ষ রায় ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, এখন রিটায়ার করার পর আর পড়াতে যান না, কিন্তু তাঁর এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। আজ এখানে বক্তৃতা, কাল ওটা উদ্‌বোধন, পরশু রক্তদান শিবিরে হাজির থাকা, তরশু ওমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটা কমিটির মিটিং, কী নেই। রোজ তাও একটা না দুটো-তিনটে থাকে।

টুকটুকি কে? আগের কথা থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে টুকটুকি করঞ্জাক্ষবাবুর নাতনি। করঞ্জাক্ষবাবু যদি দাদু হন, টুকটুকি তার নাতনি না হয়ে পারেই বা কী করে? না হলে সেটা খুব অন্যায় হত না? সে করঞ্জাক্ষবাবুর মেয়ের মেয়ে, কাজেই সে নাতনি। নাতনি মানে অতি আদরের নাতনি। করঞ্জাক্ষবাবু ছড়া কেটে বলেন, 'নাতনি আমার নাতনি, আনারসের চাটনি'। শুনে টুকটুকি খিলখিল করে হাসে। কিন্তু টুকটুকিকে যখন 'টিকটিকি' বলে খ্যাপাতে যান তখন সে হাসে না, 'বিখিলি দাদু' বলে দাদুকে তার ছোটো ছোটো হাতে কিল মারতে থাকে। সাধারণত নাতনিরা অতি আদরেরই হয়, না হলে বুঝতে হবে দাদু বা দিদার মধ্যে কোনো একটা গণ্ডগোল আছে। না, করঞ্জাক্ষবাবুর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল নেই। টুকটুকির মধ্যেও নেই। সে করঞ্জাক্ষবাবুর মেয়ের মেয়ে, তার আড়াই বছর মোটে বয়স। তার মধ্যে আবার কী গণ্ডগোল থাকবে? সে এখনই এমন কথা বলতে শিখেছে যে, অনর্গল কথা বলে যায়, আর করঞ্জাক্ষবাবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই কথা শোনার জন্যে পাগল হয়ে থাকেন। সেই কথার একটু নমুনা শোনাই তোমাদের।

করঞ্জাক্ষবাবুর কোলে তার দুই হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে টুকটুকি তাঁর মাথা ধরে দোলায়, বলে, 'দাদু, তোমাল মাথায় তুল নেই কেন?'

করঞ্জাক্ষবাবু বলেন, 'আমার চুল এক রাত্রিবেলায় ইঁদুরে কেটে নিয়ে গেছে।'

টুকটুকি চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'ইথ্, ইঁদুলকে ধলতে পালনি?'

'আমি কি বুড়ো হয়ে ইঁদুরের পেছনে দৌড়োতে পারি? পুলিশে খবর দিয়েছিলাম, তারা ভোঁ ভোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু ইঁদুরটা তখন এক লাফে চাঁদে চলে গেছে।'

'পুলিশ তাঁদে দেতে পাললে না?'

'পাগল নাকি? পুলিশ কী করে চাঁদে যাবে? পুলিশের ভয় আছে না?'

'কীথেল ভয়?'

'পুলিশের ভয় হল, তারা চাঁদে গেলে পাগল হয়ে যাবে?'

এইরকম কথাবার্তা চলে, যতক্ষণ টুকটুকি দাদুর সঙ্গে থাকে।

কিন্তু থাকে কতক্ষণ? সপ্তাহে একদিন হয়তো টুকটুকির মা তাকে নিয়ে দাদুর বাড়ি আসে, কিন্তু এসে শোনে দাদু গেছেন বহরমপুরে বা বনগাঁয় বা চুঁচড়োয় মিটিং করতে, বিকেলের আগে ফিরবেন না। টুকটুকির মা আর টুকটুকি দুজনেরই খুব মন খারাপ হয়। দাদুরও মন খারাপ হয় খুব, কারণ তাঁর মনে হয় টুকটুকি তাঁর বুড়ো বয়সে

পাওয়া একটা প্রাইজ। একটা দারুণ উপহার। ছোটোরা অনেক উপহার পায় জন্মদিনে, ইস্কুলে বা খেলার মাঠে। কিন্তু বুড়োদের কী আছে বলো! তারা জন্মদিনে আর উপহার পায় না, খেলার মাঠে গিয়ে স্পোর্টসে নামও দিতে পারে না। দৌড়োলেই তো হাত-পা ভাঙবে।

তখন এই নাতি-নাতনিরাই তাদের জীবনে প্রাইজ হয়ে আসে।

সব দাদুর মতোই করঞ্জাক্ষবাবুও তা জানেন না তা নয়। কিন্তু তাঁর ঘরে-বাইরে এই টানাহ্যাঁচড়া চলে, টুকটুকির সঙ্গে দেখা না হলে মন খারাপ হয়ে যায়।

এর জন্যে মাঝে মাঝে তিনি যাতায়াতের পথে কলকাতার আর-এক প্রান্তে টুকটুকিদের ফ্ল্যাটে যান, কিন্তু তখন হয়তো তার পাশের ফ্ল্যাটের বন্ধুর সঙ্গে খেলার সময়, না হয় সবে সাঁতার কেঁটে এসেছে বলে ক্লান্ত, মনে হচ্ছে একখুনি ঘুমে ঢলে পড়বে। তার সঙ্গে দাদুর গল্পসল্প ঠিক জমে না।

আর করঞ্জাক্ষবাবু যখন দু-সপ্তাহ তিন সপ্তাহের জন্যে দেশের বাইরে যান, তখন টুকটুকির জন্যে তাঁর মনটা আরও খারাপ করে। হ্যাঁ, টেলিফোনে কথা বলেন বটে তার সঙ্গে, কিন্তু টুকটুকি কিছুতেই টেলিফোনে বেশি কথা বলতে চায় না। 'দাদু তুমি থিঙ্গাপুলে— ইয়ো-ইয়ো-ইয়ো, কুলু কুলু কুলু' বলে চেঁচিয়ে টেলিফোন মাকে দিয়ে বলে, 'এবাল মাল থঙ্গে তথা বলো।'

একবার কী হয়েছে, করঞ্জাক্ষবাবু, বেশ কিছুদিন নেপালে না কোথায় গিয়ে ছিলেন, টুকটুকির সঙ্গে তাঁর অনেকদিন দেখা হয়নি। বাড়ির জন্যে যত না মন খারাপ, টুকটুকির জন্যে মন খারাপ তার চেয়ে বেশি। তার

জন্যে নানা উপহার কিনেছেন, মেয়েকে ফোন করে বলেছেন, ফেরার পরদিন মঙ্গলবার, ওইদিনই টুকটুকিকে নিয়ে তুই আমার বাড়ি চলে আসবি, দুদিন থাকবি। কোনো কথা শুনব না। মেয়ে বলেছে, ঠিক আছে, আমার স্কুল এখন ছুটি চলছে, দুদিন থাকার অসুবিধে নেই। আমার শাশুড়ি মা দুদিন ম্যানেজ করে নিতে পারবেন। তুমি ভালোয় ভালোয় এসে পড়ো দেশে।

তা করঞ্জাক্ষবাবু ভালোয় ভালোয় এসে পড়লেন।

এসেই দেখেন, চিঠি, কাগজপত্র, বই ইত্যাদি নানা জিনিস ডাকে এসে আছে তাঁর অপেক্ষায়। এ রকম প্রত্যেকবারই হয়। টুকটুকির দিদা সেগুলোকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখেন, চিঠিপত্র একদিকে, বই-কাগজ অন্যদিকে, ছাপানো কার্ড, ইলেক্ট্রিক-টেলিফোনের বিল ইত্যাদি আর-এক দিকে। আর যাকে বলে 'ফালতু ডাক', মানে বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন, সব আর-একদিকে। শেষেরটা দেখেই ফেলে দেবার কথা, কাগজ-বিক্রিওয়ালার ঝুড়িতে যাবে সেগুলো।

করঞ্জাক্ষবাবু কাগজপত্রগুলো দিয়ে শুরু করে শেষে চিঠিপত্রের কাছে এলেন। দুখানা চিঠি দেখে তাঁর মাথায় বাজ পড়ল। দুটোই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি, কাল মঙ্গলবারেই তাদের দুটো কমিটির মিটিং, দুটোতেই করঞ্জাক্ষবাবুকে থাকতেই হবে। গিন্নিকে ডেকে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'দেখছ ব্যাটাদের কাণ্ড, দুটো বিশ্ববিদ্যালয় একই দিনে, একই সময়ে মিটিং ফেলেছে। আর দুটোই কলকাতার বাইরে, গাড়িতে যেতে একটায় দু-ঘণ্টা, আর-একটায় দেড় ঘণ্টা। আগে পরে করে যে যাব তারও উপায় নেই।'

গিন্নি বললেন, 'তা কী করবে ওরা? এ সব মিটিং তো আর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে করে না। সবাই নিজের নিজের মতো ঠিক করে।'

করঞ্জাক্ষবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'তা হলে তো একটা আমাকে বাদ দিতেই হবে। দুটোতে তো আর যেতে পারব না!'

গিন্নি বললেন, 'কাল তুমি কোনো মিটিঙেই যেতে পারবে না। আমরাই তোমাকে যেতে দেব না।'

করঞ্জাক্ষবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কেন? ইউনিভার্সিটির মিটিং!'

গিন্নি আর কথা না বাড়িয়ে বললেন, 'কাল টুকটুকি আর মেয়ে আসবে দুদিনের জন্যে। তোমার কথাতেই তারা আসছে।'

করঞ্জাক্ষবাবু কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলেন। সত্যিই তো, টুকটুকির কথা তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। এই লহমার মধ্যে হাসপাতালে পুতুলের মতো একটা শিশুর মুখ মনে পড়ল, তার পর তাঁর বাড়িতে কিছুদিন তাকে নিয়ে মেয়ের থাকা, গিন্নির গান গেয়ে গেয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো, আস্তে আস্তে চোখের সামনে তার হাঁটতে শেখা, টলমল করে চলা, আপনমনে 'বুজি-বুজি-বুজি' গান গাওয়া— সব তাঁর একে একে মনে পড়ে গেল। তাঁর বুকটা কেমন করে উঠল। কতদিন ওই ছোট্ট মুখটাকে দেখেননি।

গিন্নির দিকে দুষ্টু দুষ্টু মুখে তাকিয়ে তিনি হাতে ফোনটা তুলে নিলেন। প্রথমে ফোন করলেন এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে। বললেন, 'ভাই, একই দিনে, একই সময়ে দু-নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের মিটিং। ওটা বেশ জরুরি, তাই তোমাদের মিটিঙে এবার যেতে পারছি না।'

তারপর ফোন করলেন দু-নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদেরও বললেন, 'ভাই এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে তো একই সময়ে মিটিং। খুবই জরুরি। তাই তোমাদের মিটিঙে এ যাত্রা হাজির থাকতে পারছি না।'

গিন্নি বললেন, 'মিথ্যে কথা বললে?'

করঞ্জাক্ষ বললেন, 'কোথায় মিথ্যে বললাম? কাউকে কি বলেছি যে আমি অন্যদের মিটিঙে যাব? শুধু বলেছি, তোমাদেরটায় যাব না।'

পরের দুদিন টুকটুকিকে নিয়ে তাঁর কী রকম কাটল, সেটা তোমরা অনুমান করতেই পারো।

॥ বিজ্ঞান-প্রদর্শনী ও এক জ্ঞানবাবু ॥

সরস্বতী পুজোর তিনমাস আগে থেকেই ভাদুড়িয়া টি এম এস ইন্সটিটিউশনে সাজোসাজো রব পড়ে যায়। না, শুধুই সরস্বতী পুজোর জন্যে নয়। সে তো দু-দিনের ব্যাপার। প্রতিমা বানায় যে কুমোর সে ঠিক সময়েই কাজ শুরু করে দেয়, আর পুরুতমশাই তো ঘরেরই লোক, সংস্কৃতের বৃদ্ধ মাস্টারমশাই স্বদেশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও ছেলেমেয়েরা গুজব শোনে যে, তিনি সম্পূর্ণ নাস্তিক, ঠাকুর-দেবতা ধর্ম কিছুই মানেন না। তবু পুজোটা করে দেন। আর আজকাল তো সব 'প্যাকেজিং' হয়ে গেছে— ফুল, ফল, মিষ্টি, প্রসাদ, লুচি, খিচুড়িভোগ লাবড়া— সব যে যার মতো নামিয়ে দেবে। কাজেই সরস্বতী পুজো নিয়ে অত আগের থেকে কেউ ব্যস্ত হয় না। শুধু ছাত্রদের মাথাপিছু চাঁদার রসিদ বই ছাপতে চলে যায়।

আসল ব্যস্ততা অন্য একটা ব্যাপারে। এই বারো ক্লাসের স্কুল ভাদুড়িয়া টি এম এস (অর্থাৎ তারকমোহন সান্যাল— স্কুলের জমিটি তাঁরই দেওয়া) ইন্সটিটিউশনে সরস্বতী পুজোর সময় একটা বিশাল প্রদর্শনী হয় প্রত্যেকবার— বিজ্ঞান-প্রদর্শনী। না, শুধু বিজ্ঞানেরও নয়। ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি, হাতের কাজ, নানা বিভাগের নানা বিষয় নিয়ে ছবিওয়ালা পোস্টারও থাকে। যেমন ধরো বাংলা বিভাগ হয়তো নজরুলের জীবনী নিয়ে পোস্টার আর খবরাখবরের প্রদর্শনী করল, ইতিহাসের মাস্টারমশাই বাংলার পুরোনো রাজধানী গৌড়ের নানা মসজিদের বড়ো বড়ো ছবি টাঙালেন তাদের ছোট্ট পরিচয় লিখে। আজকাল কম্পিউটার হওয়াতে এসব কাজ সহজ হয়েছে। ফলে সবদিক থেকেই একটা বেশ জমজমাট প্রদর্শনী হয় স্কুলে, আশেপাশের দু-দশটা স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা দেখতে আসে, বড়োরাও আসেন।

তবু বিজ্ঞান প্রদর্শনীটাই, সমস্ত প্রদর্শনীর, যাকে বলে, মধ্যমণি। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান—সব কিছু নিয়েই প্রদর্শনী হয় এবং এই তিন মাস বিজ্ঞানের স্যাররা রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা ছোটো ছোটো দল তৈরি করে দেন—কারা ফিজিক্সের দলে থাকবে, কারা কেমিস্ট্রির, কারা বায়োলজির— এইরকম। তা ছাড়া সব বিভাগেই নানা বিষয়, এক্সপেরিমেন্ট আর প্রজেক্ট ভাবা হয়ে যায়, প্রজেক্ট অনুযায়ী মডেল তৈরি হতে থাকে—সে এক বিপুল কর্মকাণ্ড—এক মহাযজ্ঞ বললেই হয়।

এই সব ব্যাপার নিয়ে স্যারদের মধ্যে নানারকম খুনশুটি হয়, ছেলেমেয়েরা তার সবটা দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। যেমন পণ্ডিতমশায় স্বদেশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন টিচার্স রুমে জিজ্ঞেস করলেন, "এবারে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে কোন্ কোন্ বিষয় প্রদর্শনের পরিকল্পনা হচ্ছে হে?"

বিজ্ঞানের এক নতুন স্যার সমীরণ বলে উঠল, "বলব কেন, স্যার? আমি বলি আর আপনি সবাইকার কাছে ফাঁস করে দেন—অন্য স্কুলগুলো আমাদের আইডিয়া মেরে দিক—ইয়ার্কি নাকি?"

স্বদেশরঞ্জন এসব আক্রমণ গায়ে মাখেন না। তবু বললেন, "আরে অর্বাচীনের মতো কথা বলছ কেন। অন্য বিদ্যালয়ের কাছে কে বলতে যাচ্ছে? আমি সরস্বতী -পূজা উৎসব সমিতির কর্মপরিষদের সদস্য, তাই কৌতূহলবশত এ প্রশ্ন করেছিলাম। তা তোমাদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়ে তোমরা ধুয়ে খাও না, আমার কী?"

টেবিলের ও প্রান্ত থেকে চ্যাংড়া বাংলার শিক্ষিকা মণিমালা বলে উঠল, 'ইস, স্বদেশদা, 'ধুয়ে খাও' কথাটার শুদ্ধ বাংলা বলতে পারলেন না? বলবেন তো, "তোমাদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়ে তোমরা ধৌত করে ভক্ষণ করো" —তা নয়, কি না 'ধুয়ে খাও!' ছি। সংস্কৃতের শিক্ষক হয়ে এই অপভাষা!'

স্বদেশরঞ্জন মণিমালার দিকে একবার অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেন, 'দিদিভাই, তোরা সংস্কৃতও শিখিসনি, বাংলাও শিখেছিস অশ্বডিম্ব! 'ধৌত করে ভক্ষণ করো' আমি বলতেই পারতুম, এমনকী 'প্রক্ষালিত করে গলাধঃকরণ করো'-ও বলতে পারতুম, কিন্তু সেটা কি বাংলা হত? বাংলা ভাষাটাকে তোদের চেয়ে আমি কম ভালোবাসি ভাবিস না।'

মণিমালা চুপ করে গেল বটে, কিন্তু এবারে আক্রমণ এল অন্য দিক থেকে। ইতিহাসের স্যার ধীরেন চক্রবর্তী ওদিক থেকে ফোঁস করে উঠলেন, 'স্বদেশদা আপনি যে সরস্বতী পুজো করেন প্রত্যেবার, কিন্তু অপনার টিকি নেই কেন?'

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে স্বদেশবাবু একটু থতোমতো খেয়ে গেলেন, কিন্তু পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কেন, টিকি না থাকলে পুজো করা যায় না?'

ধীরেনবাবুর পাশ থেকে ইংরেজির রঞ্জিত বলে উঠল, 'না মানে টিকি না থাকলে ঠিক পুরুত-পুরুত মনে হয় না কিনা। আর কার কাছে যেন শুনেছি টিকির মধ্যে দিয়ে অ্যান্টেনার মতো আকাশের বিদ্যুৎ ঢুকে যায় মাথায়, এটা শুধু টিকি নয়।'

স্বদেশরঞ্জন জবাব দিলেন, 'ভাই, আমার আর বিদ্যুৎ চাই না, বিদ্যে চাই। মানে জ্ঞান চাই। তার জন্যে চক্ষু-কর্ণই যথেষ্ট, টিকির প্রয়োজন দেখি না।'

'আর' একটু থেমে বললেন, 'কেন? অন্যত্র দ্যাখোনি যে, পুরোহিত প্যান্ট-শার্ট পরে হাতে একটা শপিংব্যাগে নকল গরদের কাপড় আর চাদর নিয়ে চলে এলেন, তারপর আড়ালে গিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করে পুজোয় বসে গেলেন? এ না দেখে থাকলে বাঙালি সংস্কৃতির কী আর প্রত্যক্ষ করেছ তোমরা। দুর্গাপূজার মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতি বৎসর এ দৃশ্য দেখবে।'

তা অবশ্য ঠিক কথা। অন্য স্যাররা কথাটা শুনে একটু মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, এরকম অনেকেরই দেখা আছে। ধীরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির লক্ষ্মীপুজোতেও এরকম ঘটে। সক্কালবেলায় দশটা নাগাদ পুরুতমশায় আসেন, পুজো করেই প্যান্টশার্ট পরে বড়োবাজারে চলে যান, ওখানে কোন্ মাড়োয়ারির গদিতে তিনি হিসেব লেখেন। তা স্বদেশদা কথাটা খুব ফ্যালনা বলেননি।'

স্বদেশরঞ্জন খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'কাজেই তোমাদের পুরোহিতের মস্তকের শিখা নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। আমি পুজোটা উপযুক্তভাবে নির্বাহ করি কিনা সেটাই লক্ষ কোরো।'

তা স্বদেশবাবু করেন। তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান যেমন গভীর, তেমনই 'সংস্কৃত' উচ্চারণও চমৎকার। 'বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ'-কে তিনি 'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ' বলেন না, এবং পুজোর সমস্ত কাজকর্ম তিনি নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেন।

'আর', একটু গম্ভীরভাবে স্বদেশরঞ্জন বললেন, 'যে পুরোহিতের ইন্দ্রলুপ্ত আছে সে কী করবে?'

এই কথাটায় সবাই কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। এমনকী বাংলার টিচার মণিমালাও। 'ইন্দ্রলুপ্ত' কী? কোনো বিচ্ছিরি অসুখ নাকি? যাতে হাত-পা অবশ হয়ে যায় বা কিছু?

ড্রইং-কাম-ড্রিল মাস্টার জনার্দনবাবু মিনমিন করে বললেন, 'স্বদেশদা, মানে'...

স্বদেশরঞ্জন বললেন, 'এই দ্যাখো, তোমাদের কেমন স্তম্ভিত করে দিলম। ইন্দ্রলুপ্ত মানে টাক।'